সৌরভ গোস্বামী

সেভেন সিস্টার্স উইদআউট শেখ হাসিনা

ওয়াহিদ তুষার অনূদিত

কলি প্রকাশনী

সেভেন সিস্টার্স উইদআউট শেখ হাসিনা
সৌরভ গোস্বামী
ওয়াহিদ তুষার অনূদিত

কলি প্রকাশনী প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক

প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক
মো. জহুরুল হক

প্রকাশক
এস এম মহির উদ্দিন কলি
কলি প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
সজীব ওয়ার্সী

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় প্রিন্টার্স

Seven Sisters without Sheikh Hasina by **Sourav Goswami. Translated by Wahid Tusar.** Published by S. M. Mohir Uddin Koli of Koli Prokashoni,

e-koliprokashoni@yahoo.com
www.koliprokashoni.com

কলি প্রকাশনীর যে-কোনও বই ঘরে বসেই যোগাযোগ করুন
www.facebook.com/koliprokashoni

একমাত্র পরিবেশক: **ডাংগুলি**

এই বইয়ে আমরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত সাতটি রাজ্যের ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব

সূচিপত্র

সেভেন সিস্টার্স পরিচিতি ৯–২৩
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ২৪–৪০
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত, এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিশ্লেষণ।

ষড়যন্ত্রের উদ্ভব ৪১–৫৯
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রভাব ফেলা ষড়যন্ত্রগুলোর বিশ্লেষণ।

শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স রক্ষা ৬০–৭৪
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থিতিশীলতা রক্ষায় কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে শেখ হাসিনার ভূমিকা অনুসন্ধান।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সেভেন সিস্টার্সের উপরে প্রভাব ৭৫–৮৫
শেখ হাসিনার অনুপস্থিতি কীভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে তার বিশ্লেষণ।

ভারতের কৌশলগত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৮৬–১০৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশল, সীমান্ত নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন কার্যক্রম এবং সামরিক অবকাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা ১০৭–১২০
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রচারের জন্য বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক ও সামাজিকনীতির আলোচনা।

ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ১২১–১৩৩
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর প্রভাব ফেলতে থাকা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ।

স্থানীয় শাসনের ভূমিকা ১৩৪–১৪৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্থানীয় শাসনের ভূমিকার অনুসন্ধান।

গণমাধ্যম ও জনমতের প্রতিফলন ১৪৭–১৬৩
উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে গণমাধ্যমের উপস্থাপনা কীভাবে জনমত গঠন করে এবং রাজনৈতিক আলোচনা ও নীতিতে প্রভাব ফেলে তার পর্যালোচনা।

ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ১৬৪–১৭৩
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ এবং এর স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সুপারিশ।

সেভেন সিস্টার্স পরিচিতি

'সেভেন সিস্টার্স' ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে বোঝানোর জন্য বহুল প্রচলিত একটি নাম। এই সাতটি রাজ্য হলো—অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, এবং ত্রিপুরা। এই অঞ্চলটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এদেরকে 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার' হিসেবেও বলা হয়। এই সাতটি রাজ্যকে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি সংকীর্ণ বা ছোটো জমির টুকরো, যেটাকে শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেন'স নেক' বলা হয়। আকার এবং জনসংখ্যায় তুলনামূলকভাবে ছোটো হলেও, এই রাজ্যগুলোর কৌশলগত অবস্থানের জন্য এরা প্রত্যেকেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেভেন সিস্টার্স-এর চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভুটানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

ঐতিহাসিকভাবে সেভেন সিস্টার্স (উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য) বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং ঐতিহ্যের মিশ্রণ নিয়ে গঠিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং স্বকীয়তা তাদের স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, এবং স্বাধীনতার পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, যেমন নাগা, মিজো, খাসি, বোরো ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, এবং সামাজিক প্রথা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। এসব রাজ্যের আলাদা আলাদা ঐতিহ্য তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে, ব্রিটিশরা উত্তর-পূর্ব ভারতের ওপর কিছু প্রভাব ফেলেছিল যদিও এই অঞ্চল সরাসরি পুরোপুরি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো আনার চেষ্টা করলেও, স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তিশালী ধারা গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও ধরে রাখতে সহায়তা করে।

ভারতের স্বাধীনতার পর, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং প্রশাসনের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নীতি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করে, যা রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই প্রতিরোধ এবং আন্দোলনগুলো স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্বকীয়তাকে সংরক্ষণের লক্ষ্যেই মূলত পরিচালিত হয়েছিল। আর এসবের (ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পরে ভারত সরকারের কেন্দ্রিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ) জন্যই এই অঞ্চল এতটা সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

অরুণাচল প্রদেশকে 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলা হয়। এখানে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে, যাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে।

এই রাজ্যের ইতিহাস তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন সিল্ক রোডের সঙ্গে সম্পর্কিত।[১] তিব্বতীয় ভিক্ষুরা এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, যা এখানকার মানুষের সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় চর্চায় গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অরুণাচল প্রদেশের অনেক দূরে অবস্থান এবং এই এলাকার ভূখণ্ডের দুর্গম গঠনের কারণে এখানকার মানুষ তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা অনেকটাই এখন পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছে। যদিও আধুনিকীকরণ ধীরে ধীরে এখানেও প্রভাব ফেলছে।

[১] অরুণাচল প্রদেশের ইতিহাস তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন সিল্ক রোডের সঙ্গে সম্পর্কিত বলার অর্থ হলো, এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিকাশে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের বড়ো ভূমিকা ছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম মূলত তিব্বত থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে, এবং তিব্বতীয় ভিক্ষুরা এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। এর ফলে অরুণাচল প্রদেশের অনেক এলাকায় বৌদ্ধধর্মের চর্চা শুরু হয় এবং তা এখানকার মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

প্রাচীন সিল্ক রোড ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ, যা তিব্বত ও চীনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপন করত। এই বাণিজ্য-পথ ধরে শুধু পণ্য-সামগ্রীই নয়, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জ্ঞানও ছড়িয়ে পড়ত। সিল্ক রোডের মাধ্যমে তিব্বত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী অঞ্চলের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের সংযোগ তৈরি হয়েছিল, যা এখানকার ধর্ম, সংস্কৃতি, এবং জীবনযাত্রার ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

এভাবে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং সিল্ক রোডের বাণিজ্যিক সংযোগ অরুণাচল প্রদেশের ইতিহাস রচনায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

আসামে অনেক বড়ো বড়ো চা বাগান এবং বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী রয়েছে। এই রাজ্যের ইতিহাস আহোম-রাজবংশের সময় থেকে শুরু হয়, যারা প্রায় ছয়শো বছর ধরে এখানে শাসন করেছে। আহোমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এসেছিল এবং তারা এখানে একটি ভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল, যা এখনো আসামের সমাজের বিভিন্ন চর্চাতে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশরা যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন আসাম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র এবং এই রাজ্য ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেও বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। আসাম তার জীববৈচিত্র্যের জন্যও বিখ্যাত, বিশেষ করে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, যা এক শৃঙ্গ-বিশিষ্ট গণ্ডারের জন্য সুপরিচিত।

সেভেন সিস্টার্স-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হলো মণিপুর। এই মণিপুর এমন একটি রাজ্য, যেটা তার বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য এবং সুসমৃদ্ধ যুদ্ধকলার ইতিহাসের জন্য অনেক বিখ্যাত। এখানে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধকৌশল ও শারীরিক প্রশিক্ষণের চর্চা ছিল, যা পুরো রাজ্যের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। প্রাচীন খেলা পোলো—যার উৎপত্তি মণিপুরে, সেই যুদ্ধকালীন সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। মণিপুরের এই যুদ্ধকলা-সম্পর্কিত সংস্কৃতির উদাহরণগুলো এটাই প্রমাণ করে যে মণিপুরের মানুষ শারীরিক শক্তি, দক্ষতা এবং যুদ্ধকৌশলকে বরাবরই উচ্চ মর্যাদা দিত এবং তাদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ হিসেবেও এসবকে বিবেচনা করত।

মণিপুরের ইতিহাসে ১৮শ শতকে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার একটি বড়ো পরিবর্তন আনে। বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার মণিপুরের প্রচলিত ধর্মীয় জীবন ও

বিশ্বাসব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত করে। এর ফলে, নতুন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে ওঠে, যা মণিপুরের সমাজ ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাদের ধর্মীয় চর্চা ও রীতিনীতি নতুনভাবে গঠিত হয়।

মণিপুরি-নৃত্য ভারতের আটটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে অন্যতম, এবং এটি মণিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই নৃত্যরূপ মণিপুরের শিল্প ও সংস্কৃতির সৌন্দর্য এবং সৃজনশীলতাকে তুলে ধরে। এর নৃত্যশৈলী অত্যন্ত মার্জিত, কোমল ও আবেগীয়—যা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবহে পরিবেশিত হয়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব থাকায় মণিপুরি-নৃত্য সাধারণত ভগবান কৃষ্ণ এবং রাধার লীলার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই নৃত্যের মাধ্যমে মণিপুরের ঐতিহ্য, ধর্মীয় ভাবনা এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়েছে।

এটি শুধু একটি নৃত্যশৈলী নয়, বরং মণিপুরের অধিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে গভীর ভাবনা এবং আবেগের প্রতিফলন। এই নৃত্যশৈলী শুধু তাদের বিনোদনের জন্য নয়, বরং মণিপুরের মানুষের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ হিসেবেও এটাকে দেখা হয়। মণিপুরের ধর্মীয় উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে এই নৃত্যশৈলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা মণিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

মেঘালয়কে 'মেঘের আবাস' বলা হয় এবং এই রাজ্যটি মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ ও অন্যান্য ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে প্রধানত তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে—খাসি, গারো, এবং জৈন্তিয়া। এই গোষ্ঠীগুলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছে।

মেঘালয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর মাতৃকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে সম্পত্তি বণ্টন, দেখাশোনা এবং বংশপরম্পরা নারীর মাধ্যমেই চলে। এই কারণে মেঘালয় ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আলাদা।

মেঘালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত সুন্দর, বিশেষ করে জীবন্ত শিকড়ের সেতুগুলো—যা এখানকার মানুষের এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখায়। মানুষ এবং প্রকৃতি একে অপরের সঙ্গে কতটা ভালোভাবে মিলেমিশে থাকতে পারে এই সেতুগুলো তারই একটি সুন্দর এবং জলজ্যান্ত উদাহরণ।

মিজোরামের ইতিহাসে খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপক বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯শ শতকের শেষের দিকে খ্রিষ্টান মিশনারিরা মিজোরামে এসে ধর্ম

প্রচার শুরু করেন, যা ধীরে ধীরে মিজোরামের সমাজে বড়ো পরিবর্তন আনে। মিজোরামের মানুষ ব্যাপকভাবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে, এবং এই ধর্মীয় পরিবর্তন রাজ্যের সংস্কৃতিতেও গভীর প্রভাব ফেলে।

মিজোরাম আগে আসামের একটি অংশ ছিল, কিন্তু ১৯৮৭ সালে এটি একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীনতার প্রক্রিয়াটি মিজো জনগণের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার ইচ্ছার প্রতিফলন। মিজো জনগণ চেয়েছিল নিজেদের শাসন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নিজেদের হাতে রাখতে। তারা চেয়েছিল তাদের সংস্কৃতি এবং সমাজের উপর বাইরের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকুক, তাই তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল। মিজো মানুষরা একতায় বিশ্বাসী এবং তাদের সমাজে সবাই মিলে চলতে পছন্দ করে। তাদের উৎসবগুলো খুবই আনন্দময় ও বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ভরা। তারা তাদের পুরোনো রীতি ও ঐতিহ্যকে ভালোভাবে ধারণ ও রক্ষা করে, কিন্তু পাশাপাশি আধুনিক জীবনেও মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

নাগাল্যান্ড ভারতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য—যেখানে ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত যোদ্ধা এবং শিরচ্ছেদকারী উপজাতিরা[২] বসবাস করে। নাগাল্যান্ডের অধিবাসীরা ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং পরবর্তীকালে ভারতের অন্তর্ভুক্তি মেনে না নিয়ে স্বাধীনতার দাবিও জানায়। ১৯৫০-এর দশকে শুরু হওয়া নাগা-বিদ্রোহ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পুরোনো সংঘর্ষগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে এখনো বিবেচিত হয়ে আসছে। নাগাল্যান্ডে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু রাজ্যের মানুষ এখনো আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের (নিজেদের শাসনের) দাবি করে চলেছে। আর তাদের এই দাবির বিষয়টি এখনও রাজ্যের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ

[২] ঐতিহাসিকভাবে নাগাল্যান্ডের উপজাতিগুলোকে যোদ্ধা এবং শিরচ্ছেদকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কারণ তারা দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধকৌশল-এ দক্ষ এবং সাহসী মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। বিশেষ করে, শত্রুদের শিরচ্ছেদ করা তাদের সমাজে বীরত্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। এটি তাদের যুদ্ধের কৌশলের একটি অংশ ছিল এবং শত্রুদের ভয় দেখানোর একটি উপায়ও ছিল। প্রতিপক্ষের শিরচ্ছেদ করা এবং সেই শিরকে সংগ্রহ করা তাদের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল, যা তাদের সাহসিকতা এবং শক্তিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে এই প্রথা এখন আর প্রচলিত নয় বরং এটি কেবল ইতিহাসের অংশ হয়েই আছে।

বিষয় হিসেবে রয়েছে। এ ছাড়া নাগাল্যান্ড তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্যও বিখ্যাত, বিশেষ করে হর্নবিল উৎসবের জন্য, যা বিভিন্ন নাগা-উপজাতিদের নাচ, গান এবং ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়।

ত্রিপুরার ইতিহাসে হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ছিল। যদিও এ রাজ্যের রাজপরিবার সবসময় হিন্দু ধর্ম মেনে চলত, ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতিনীতিতে বিশ্বাস করত। ত্রিপুরার ইতিহাস বাংলার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, কারণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের উপর প্রভাব ফেলেছে। বাংলার প্রভাব ত্রিপুরার ভাষা, শিল্প, এবং সামাজিক জীবনে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা ভারতের অংশ হয় এবং এর পরবর্তী উন্নয়ন এবং এর কৌশলগত অবস্থান, যেমন বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে অবস্থিত হওয়া এবং সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থান করা বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছে। এ রাজ্যের জনসংখ্যায় বাঙালি এবং আদিবাসীদের মিশ্রণ রয়েছে, যা ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও ব্যাপক বৈচিত্র্য এনেছে।

ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল—যেখানে ধান, পাট এবং চা প্রধান ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। এ ছাড়াও ত্রিপুরায় চা বাগান ও জুট (পাট) উৎপাদন এ রাজ্যের মূল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এবং ত্রিপুরার কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান একে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে পরিণত করেছে।

সেভেন সিস্টার্স অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব

সেভেন সিস্টার্স রাজ্যের (ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো) কৌশলগত গুরুত্ব শুধুমাত্র তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য নয়, বরং তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যও। এই অঞ্চলের অবস্থান এমন যে এটি চীন, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে, যা ভারতের প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে চীন এবং মায়ানমারের সঙ্গে দীর্ঘ ও ছিদ্রপূর্ণ (porous)[৩] সীমান্ত থাকার কারণে এই

[৩] ছিদ্রপূর্ণ (porous) সীমান্ত বলতে এমন সীমান্তকে বোঝায়, যেখানে কঠোর বা শক্তিশালী সুরক্ষার অভাব থাকে। ফলে মানুষ, পণ্য বা অবৈধ সামগ্রী সহজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের সীমান্তে সাধারণত নজরদারি কম থাকে।

অঞ্চল নিরাপত্তার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এসব সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র পাচার, এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঝুঁকি বেশি থাকে। এ কারণে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীকে এই অঞ্চলটিতে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। একই সঙ্গে, এই অঞ্চলের কৌশলগত অবস্থান ভারতকে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অরুণাচল প্রদেশ হলো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি রাজ্য। চীন এই রাজ্যকে 'দক্ষিণ তিব্বত' বলে দাবি করে। চীনের এই দাবি ভারতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে। আর তাই অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরেই এই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত-দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে।

ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত-বিতর্ক মূলত দুটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত: পশ্চিমাঞ্চলীয় লাদাখ এবং পূর্বাঞ্চলীয় অরুণাচল প্রদেশ। এই সীমান্তকে 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল' (LAC) বলা হয়, যা মূলত দুই দেশের মধ্যে ৩,৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিভাজনরেখা। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে LAC-কে অস্থায়ী সীমানা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এর প্রকৃত অবস্থান নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অস্পষ্টতা এবং মতভেদ এখনো বর্তমান রয়েছে।

LAC নিয়ে দ্বন্দ্বের মূল কারণ হলো দুই দেশ এই সীমানা সম্পর্কে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। চীন দাবি করে যে ভারতের কিছু এলাকা তাদের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, যাকে চীন দক্ষিণ তিব্বত বলে অভিহিত করে। অন্যদিকে ভারত মনে করে চীন লাদাখের কিছু অংশ বিশেষত আকসাই চীন এলাকা অবৈধভাবে দখল করে আছে। এই সীমান্তের সঠিক চিহ্নিতকরণের অভাবে প্রায়ই দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ ঘটে থাকে।

LAC-তে নিয়মিতভাবে দুই দেশের সেনাদের মধ্যে পেট্রোলিংয়ের সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হয়—যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও খারাপ করে। সামরিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে একাধিক আলোচনার পরেও এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি, যার ফলে এখানের সীমান্ত পরিস্থিতি জটিল ও উত্তেজনাপূর্ণ রয়ে গেছে।

LAC নিয়ে চলমান মতভেদ শুধু দুই দেশের সামরিক উত্তেজনা বাড়ায় না, বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। তবে, ভারত ও চীন বিভিন্ন আলোচনা এবং চুক্তির মাধ্যমে এই বিরোধের সমাধানের চেষ্টা করছে, যদিও এখনো কোনো স্থায়ী সমঝোতা হয়নি।

যাই হোক, বাংলাদেশের কাছাকাছি সেভেন সিস্টার্স অঞ্চলের অবস্থানের কারণে এখানের কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের সঙ্গে অনেক দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে এবং এর ফলে এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক কখনও ভালো, কখনও খারাপ হয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, সীমান্তে অভিবাসন এবং পানি ভাগাভাগি নিয়ে এ দু-দেশের অনেক বিরোধ আছে। যদিও এসব সমস্যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে। তবে, দুই দেশ একসঙ্গে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করেছে, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম, এবং যোগাযোগ-প্রকল্প। এসব যৌথ উদ্যোগ দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করেছে এবং অঞ্চলটির কৌশলগত অবস্থানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

অপরদিকে মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, এবং মিজোরামের সঙ্গে সীমান্ত-অঞ্চল রয়েছে। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (Act East Policy) অনুসারে, এই সীমান্তের গুরুত্বও বেড়ে গেছে। এই নীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্ক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (Act East Policy) মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক উন্নত করার জন্য তৈরি হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে 'লুক ইস্ট পলিসি' নামে যে নীতিটি শুরু হয়েছিল সেটিরই পরিমার্জিত রূপ হলো এই 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ASEAN (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংঘ) এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা।

এই নীতির ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর গুরুত্ব বেড়ে গেছে, কারণ এই অঞ্চলগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের